সূচিপত্রঃ

১)ভূমিকা

২)যুগে যুগে মহামারীর আক্রমণ

৩) যেসমস্ত কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় ঘটে

৪) মহাদেশ সমূহের মহামারীর বিভৎস চিত্র

৫)মহামারীতে মনীষীদের অবদান ও কিছু ঘটনা

৬)মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত কোরআন আয়াত

৭) উপসংহার

ভূমিকাঃ

ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে মহামারির বিভৎসতার চিত্র পাওয়া যায়। মহামারি প্লেগ শহর-নগরকে এমনভাবে খালি করেছিল যে, মৃতদের লাশ দাফনের জন্যও কোনো মানুষ পাওয়া যেত না। দেখা দিয়েছিল কফিনের অভাব। লাশ বহনের জন্য খাঁটিয়া না

পেয়ে মানুষ দরজার পাল্লা ব্যবহার করেছে। কাফনের অভাবে কম্বল দিয়ে কবরে শুইয়ে দিতে হয়েছে। অবশ্য অনেকের ভাগ্যে তাও মেলেনি। গণকবর ছিল একমাত্র উপায়। যাদের কপালে তাও জুটেনি তাদের লাশ রাস্তাঘাটে পড়ে থেকে পচে গলে গেছে।প্রাচীনকাল থেকে রোগ-ব্যাধির সঙ্গে মানুষের বসবাস। নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে লড়াই করে মানবসভ্যতা টিকে আছে। কিন্তু তারপরও যুগে যুগে এমন কিছু রোগ এসেছে যাদের সামনে টিকতে না পেরে হুমকির মুখে পড়েছে বহু জাতি। বিশ্বকে পক্ষাঘাতের রোগীর মতো অচল করে দিয়েছে কখনো কখনো। পৃথিবী ভুলতে পারবে না কোনোদিন সেইসব ঘাতক মহামারির নাম। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, তাগড়া যুবক কাউকেই রেহাই দেয়নি। বাছ-বিছার করেনি রক্ত-বর্ণ, ধনী-নির্ধনের। বহু রাজা-উজির, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী টলে গেছে সেইসব কালোমৃত্যুর ছোবলে।

যুগে যুগে মহামারীর আক্রমণঃ

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই আরবের মানুষ রোগ-ব্যাধিকে সঙ্গে করে টিকে আছে। নানা সময় মরণঘাতি নানা অসুখ আক্রমণ করেছে, আরবরাও নিজেদেরকে রক্ষা করার মতো প্রতিরোধী ব্যবস্থা নিয়েছে। রোগকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে আখ্যান,

বিশ্বাস। প্রাচীন আরবরা মনে করতো মহামারি দেব-দেবীদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। এ জন্য দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করা ছাড়া রেহাই নেই। কখনো বা মনে করতো মহামারি মূলত মানুষকে নিয়ে বদ জিনের নিষ্ঠুর খেলা। নিজেদের রোগের হাত থেকে বাঁচানো জন্য জিনকে তাড়াতে নানা রকম কাজ করতো তারা।মহামারিকে কেন্দ্র করে ইসলামপূর্ব আরবদের মাঝে আরো নানা ধরনের সংস্কার চালু ছিল। আরবরা মনে করতো মহামারি ছড়িয়ে দেওয়া 'খারাপ আত্মা'দের কাজ। এ জন্য ওরা নানা তাবিজ-কবজ ব্যবহার করতো। বিভিন্ন প্রাণীর হাড়, চোখ, পা, ঘোড়ারখুঁড় দেয়ালেও চৌকাঠে টাঙিয়ে রাখতো। বিশ্বাস করতো এসব তাদের বদদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে।প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশর প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই নানা ঘটনার সাক্ষী। বহু রোগ-বালাই বারবার আঘাত করেছে দেশটিতে। হাজার হাজার বছর আগে দুনিয়া শাসনকরা ফারাওদের মমিতে পাওয়া গেছে গুটি বসন্তের দাগ। এ থেকে গবেষকরা মনে করেন, মিশরে ফারাওদের ডোবার পেছনে রয়েছে গুটি বসন্তের মতো মহামারির প্রভাব। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে লিবিয়া, ইথিওপিয়া, মিশর ও গ্রিসে ছড়িয়ে পড়ে একটি মহামারি। টাইফয়েড জ্বরের এই মহামারিতে ওই অঞ্চলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়।২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন শ বছর উত্তর আফ্রিকা, রোম ও মিশরে গেঁড়ে বসেছিল সাইপ্রিয়ান প্লেগ। বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী এ মহামারিটি রাজপরিবার ও রোমান সাম্রাজ্যকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এ মহামারিতে আক্রান্ত

হয়ে মৃত্যুবরণ করা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন চার্চের একজন যাজক। তার নামানুসারেই প্লেগের নাম হয় সাইপ্রিয়ান প্লেগ।৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে মিশর থেকেই প্রথম ছড়িয়ে পড়ে জাস্টিনিয়ান প্লেগ নামের মানব বিধ্বংসী একটি মহামারি। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নামানুসারে এ রোগের নাম হয় জাস্টিনিয়ান প্লেগ। মিশর থেকে ফিলিস্তিন, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এ মহামারি। কেড়ে নেয় প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ মানুষের জীবন কেড়ে নেয় ইঁদুরবাহি এ রোগ।আরবি 'তাউন' অর্থ প্লেগ। 'আমওয়াস' প্যালেস্টাইনের আল-কুদস ও রামাল্লার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। এখান থেকেই এই মহামারীটির সূত্রপাত। আমওয়াস থেকে এটি শামে (সিরিয়ায়) ছড়িয়ে পড়ে। ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ। জেরুসালেম বিজয়ের দ্বিতীয় বছর। মুসলিম বিশ্বের শাসনক্ষমতায় রয়েছেন নবি মুহাম্মদের সতীর্থ খলিফা ওমর। শামের উদ্দেশে বের হয়েছেন খলিফা। হেজাজ ও শামের মাঝামাঝি একটা অঞ্চলে থামেন খলিফা ওমর। এ সময় খবর আসে শামে মহামারি দেখা দিয়েছে। খলিফা নবির বাণী— 'মহামারি আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করবে না' স্মরণ করে শামে না গিয়ে ফেরত আসেন এবং শামের গভর্নর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকেও মদিনায় আসার নির্দেশ দেন। আবু উবায়দা তার সেনাবাহিনী ও জনগণকে ছেড়ে মদিনায় যেতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত এ মহামারিতে শামের বিশ হাজার বাসিন্দার সঙ্গে তারও মৃত্যু হয়।১৩৪৬ সাল থেকে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত এ

মহামারিতে ইউরেশিয়ায় ২০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক সূত্রমতে আল-মাউত আল-আসওয়াদের কারণে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।এ মহামারিতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় একদিনেই বিশ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৩৪৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৩৪৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কায়রো ও পূর্ব-মিশরের বেলবাইসে মৃত্যু হয় দুই লক্ষ মানুষের।

যেসমস্ত কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় ঘটেঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা, যাতে মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হয়ে থাকে। অনেকের মতে, এটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবেই ঘটে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাজ-কর্মের প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। তবে পবিত্র কোরআন এর ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তিনি তাদের

কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। ’
(সুরা : রোম, আয়াত : ৪১)।
অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের নাফরমানির বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। বিপর্যয় অনেক রকমের হতে পারে। যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে।(কুরতুবি, বাগভি)।খোদাদ্রোহিতা, জেনা, ব্যভিচার, পরকীয়া, অন্যায়-অত্যাচার দুনিয়ায় যত বাড়বে, ততই দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ বাড়বে।নুহ (আ.) তার কওমকে আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তবু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহর আজাব আসে। এক ভয়ংকর প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস তাঁর জাতির অবাধ্য লোকদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন প্লাবন সেই জাতিকে গ্রাস করেছিল, যেই প্লাবন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে ইতিহাস হয়ে আছে। তখন নুহ (আ.)-এর নৌকায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই রক্ষা পেয়েছিল। আল্লাহ বলেন, ‘আমি তার (নুহের) বংশধরদের অবশিষ্ট রেখেছি বংশপরম্পরায়। ’
(সুরা : সাফফাত, আয়াত : ৭৭)

মহাদেশ সমূহের মহামারীর বিভৎস্য চিত্রঃ

ধর্ম ও বাণিজ্যিক কারণে সারা বিশ্বের বড় যোগাযোগস্থল সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগর। প্রতি বছর হজ্জ্বের জন্য মুসলমানরা এখানে মিলিত হন। খুব স্বাভাবিক কারণেই যেখানে মানুষের চলাচল বেশি সেখানে রোগের বাসা বাঁধার আশঙ্কাও বেশি। বৈশ্বিক নানা মহামারি তাই পবিত্র এই শহরকেও আক্রান্ত করেছে বারবার।মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে মহামারির কারণে মক্কার হজ্জ্ব প্রায় চল্লিশ বার বাতিল করতে হয়েছিল। হজ্জ্ব মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় ইবাদত। তাই একেবারে বাধ্য না হলে তা বাতিল করার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য প্রতিবারই মহামারির কারণে যে বাতিল হয়েছে তা নয়। রাজনৈতিক সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহের কারণেও বাতিল হয়েছিল। ১৮৩১ সালের পর ১৮৩৭ সালে আবার মহামারি দেখা দেয়। এ প্লেগের আঘাতে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত লাগাতার হজ্জ্ব বন্ধ থাকে। তার পাঁচ বছর পর ১৮৪৬ সালে কলেরা মহামারি শুরু হয়। তাতে পনের হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এ মহামারি ১৮৫০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৮৫৮ সালে আরেকটি বৈশ্বিক কলেরা মহামারি মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। মিশরীয় হজ্জ্বযাত্রীরা এতে লোহিত সাগরে পালিয়ে যায়। সেখানেই তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। তারপর বিরতি দিয়ে আবারো ১৮৬৫ ও ১৮৮৩ সালে ফিরে আসে কলেরা। এ

জন্য বারবার হজ্জ্ব স্থগিত রাখতে হয়।১৮১৭ সালে ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে কলেরাবাহী একদল নাবিক মাস্কাটে এলে ওমানে কলেরার সূচনা হয়। ভারত ও আফ্রিকান বাণিজ্যিক জাহাজের প্রধান আকর্ষণ ছিল ওমানের বন্দর। ফলে এখানে খুব সহজেই ঘটেছে সংক্রমণ। এতে শেষ পর্যন্ত প্রাণ যায় পঁচিশ মিলিয়ন মানুষের। ১৮১৭ সালের কলেরাই শেষ নয়, এরপর ওমানে বারবার ফিরে আসতে থাকে এ মহামারিটি। দ্বিতীয় দফায় আসে ১৮৬৫ সালে। এবার শুধু মাস্কাটেই প্রাণ যায় ৬০০ মানুষের। কাছের আরেকটি শহরে মারা যায় আরো ১৭০০ জন। ১৭২০ সালে প্লেগ, ১৮২০ সালে কলেরা, ১৯২০ সালে স্প্যানিশ ফ্লু, ২০২০ সালে কোভিড-১৯!প্রতি একশ বছর পরপর একটি মহামারি। মিশরীয় লেখক ত্বাহা হুসাইনের মতো মিঠা গদ্যের আত্মজৈবনিক বয়ানে তিনি বলছেন,'দিনটি ছিল ২১ আগস্ট ১৯০২। সেবারের গ্রীষ্মকালটা ছিল বড় অদ্ভুত। কলেরা মহামারি মিশরকে চেপে ধরেছিল। লুটে নিচ্ছিল বাসিন্দাদের। শহর-জনপদ ধ্বংস করে দিচ্ছিল। মুছে দিচ্ছিল সমস্ত পরিবার। ...বিদ্যালয় বন্ধ। চিকিৎসক রোগী দেখছেন আর আতঙ্কে কেঁপে উঠছেন।' (আল-ইয়াওম)

মহামারীতে মনীষীদের অবদান ও কিছু ঘটনাঃ

বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা (রহ.) ৭৪৯ হিজরির দামেস্কের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে মহামারির ফলে পথে-ঘাটে মানুষ মরে পড়ে ছিল। আকাশে শকুন উড়ছিল। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে লাশগুলো টেনে সেখানে নামানো হচ্ছিল। এ সময় মুসলমানরা সবাই কোরআন হাতে পথে বেরিয়ে আসে। তিন দিন সবাই রোজা রেখেছিল। খ্রিষ্টানরা বাইবেল হাতে, ইহুদিরা তাওরাত হাতে পথে নেমে আসে। সম্মিলিতভাবে সবাই মহান প্রভুর কাছে মিনতি জানায়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা রহম করেন।সংক্রমণের বিষয়ে সতর্ক হতে রাসুল (সা.)-ও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, অসুস্থকে সুস্থের মধ্যে নেওয়া হবে না (রুগ্ণ উট সুস্থ উটের কাছে নেবে না)। (বুখারি, মুসলিম) এ-ছাড়াও বর্ণিত হয়েছে, ‘যদি তোমরা শুনতে পাও যে, কোনো জনপদে প্লেগ বা অনুরূপ মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তবে তোমরা সেখানে গমন করবে না। আর যদি তোমরা যে জনপদে অবস্থান করছো, সেটিতে তার প্রাদুর্ভাব ঘটে, তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না। (বুখারি, মুসলিম)। মনীষীরা বলেন,অজু দ্বারা সওয়াব বা নেকি অর্জনের পাশাপাশি জাগতিক উপকারও রয়েছে। যেমন, দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য অজু করলে এবং প্রতিবার আহার গ্রহণের আগে অজু করলে নানা ধরনের ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত ও হাদীসঃ

বজ্রপাত আল্লাহ তাআলার শক্তির নিদর্শনগুলোর একটি, যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাবধান করার জন্য রেখেছেন। তিনি চাইলেই যে কাউকে এর মাধ্যমে যেকোনো সময় শাস্তি দিতে পারেন।যদিও সব ক্ষেত্রে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা এমনটি করেন না।যা আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘বজ্র তাঁরই তাসবিহ ও হামদ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতারাও (তাসবিহরত আছে)। তিনিই গর্জমান বিজলি পাঠান, তারপর যার ওপর ইচ্ছা একে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) অবস্থা এই যে তারা আল্লাহ সম্পর্কেই তর্কবিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড। ’

(সুরা : রাদ, আয়াত : ১৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম। ’

(সুরা : আনআম, আয়াত : ৬৫)

তাফসিরবিদদের মতে, এর ব্যাখ্যা হলো ভূমিকম্প।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন…। ’
(সুরা : নুহ, আয়াত : ১০–১১)

অর্থাৎ মানুষ যখন তার নাফরমানি থেকে ফিরে আসবে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়ে দুর্যোগ থেকে নিস্তার দেবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের প্রবল পরাক্রমশালী প্রভু বলেছেন, যদি আমার বান্দারা আমার বিধান মেনে চলত, তবে আমি তাদের রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম, সকালবেলায় সূর্য দিতাম এবং কখনো তাদের বজ্রপাতের আওয়াজ শোনাতাম না। ’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৮৭০৮)

উপসংহারঃ

মানুষের অন্যায়, পাপ এবং অসৎ কাজের ফলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তাদের ভুল বুঝিয়ে দেন, যেন তারা তওবা করে ফিরে আসে এবং আল্লাহর পথে ফিরে যায়।ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাই নয়, বরং মানুষের পাপাচার এবং নৈতিক

অবক্ষয়ের ফল। এ ধরনের দুর্যোগের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন, তাদের কৃতকর্মের ফল আস্বাদন করান এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রসুল (স.) খুব বিচলিত হতেন। হাদিস থেকে জানা যায় যে, যখন আকাশে মেঘ জমতো বা বাতাসের গতি বেড়ে যেতো, তখন তিনি আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন এবং তওবা ইস্তেগফার করতেন। সাহাবিদেরও এসময় বেশি বেশি তওবা, ইস্তেগফার এবং নামাজে মশগুল হতে নির্দেশ দিতেন।মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ করা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের জন্য একটি অনুস্মারক যে, আমরা সৃষ্টিকর্তার সামনে ক্ষুদ্র এবং তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।